প্রথম আলো

তারিখ 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

উচ্চশিক্ষা ■

মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, হিমেল বরকত, রায়হান রাইন, রায়হান শরীফ, খোরশেদ আলম, স্বাধীন সেন, আবু তোয়াব শাকির, এ কে এম জসীম উদ্দীন, সুমন সাজ্জাদ, মাসউদ ইমরান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা ও শিক্ষকদের দলনীতি

দিনবদলের সনদ নিয়ে নতুন বছরে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। সব স্তরের মানুষ এখন প্রত্যাশার বাস্তবায়ন দেখতে অধীর। এসময়ে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষার বর্তমান ও ভাবী সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন। দু-দুটো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল পার হয়েও এখনও ভোট সরকারের অনুগত শিক্ষক দল ও তাঁদের তল্পিবাহকরা নানা কৌশলে আধিপত্য বজায় রেখেছে, রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখার কৌশল নিয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক-রাজনীতিতে ঘটছে পরিবর্তনের এক আজব অদল-বদল খেলা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ আওয়ামীপন্থী হয়ে ওঠার হিড়িক লেগেছে। একদিকে কোনো কোনো শিক্ষক ধানের শীষ ধরে ঝুলে এখন লাফ দিয়ে উঠে পড়ছেন নৌকায়। অন্যদিকে সরকার দলীয় শিক্ষকরাও বিভিন্ন উপদলে বিভাজিত হয়েও এক-একটি বড় দল। এই দলাদলিতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

অন্যদিকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এবং শিক্ষক-লাঞ্ছনার জের ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অচলাবস্থা। একে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নামের এক অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে বসেছে। এখন সে নিজেও নামতে পারছে না এবং তাকে নামাতে কেউ এগিয়েও আসছে না। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে ছেলেখেলা চলছে, তা এককথায় লজ্জাকর।

শিক্ষক-লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে শিক্ষক সমিতির পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান এবং তাদের ধর্মঘটের অছিলায় ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। সমিতির ডাকা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনকে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনেক শিক্ষক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এতে করে অচলাবস্থা কাটেনি। মানব শরীরের কোনো অংশের অসহযোগিতা যেমন গোটা শরীরের কার্যক্রমকে নাজুক করে দেয়, ব্যাপারটা তেমনই।

শিক্ষক সমিতির বর্তমান কর্মকাণ্ড শিক্ষাবিরোধী ও অযৌক্তিক। প্রথমত, প্রশাসন যে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করেছে, শিক্ষক সমিতির অনেক সদস্য এবং শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব দানকারী অনেক শিক্ষকই সেই বিচারকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'ডিসিপ্লিনারি কমিটি'র সদস্য। এখন সেই শিক্ষক সমিতিই আবার শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারকে বহাল রাখতে ধর্মঘট ডেকেছে। সংগত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, এটা কি বিচার, না দলনীতি অথবা প্রতিহিংসা? দ্বিতীয়ত, উচ্চআদালত যখন শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে কারণ দর্শাতে বলেছে এবং যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার-প্রক্রিয়ার বৈধতা ও অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তখন মাঠগরম করার উদ্দেশ্যটি আসলে কী? বিষয়টি উচ্চআদালতের এখতিয়ারভুক্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আন্দোলনের নামে এ ধরনের শিক্ষাবিরোধী কর্মকাণ্ড অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত, শিক্ষাবিরোধী এবং ক্ষুদ্রস্বার্থে শিক্ষা-কর্মকাণ্ডকে নিষ্ঠুরভাবে বাজি রাখার সামিল। সেই বাজিতে লটকে আছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ।

শিক্ষক সমিতির ধর্মঘটের মুখেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-পরীক্ষা। অথচ তাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, পূর্বঘোষিত পরীক্ষাসমূহ চলবে। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে কেবল ভর্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্রে। এরই মধ্যে গত বছরের শেষ তিন কর্মদিবসের জন্য গঠিত হয়েছিল নতুন এক শিক্ষক সমিতি, যা পূর্ববর্তী সমিতিরই নতুন সংস্করণ। এই সমিতিও কোনো ঘোষণা ছাড়াই ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি-প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্তির পথে, অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এখনো অনিশ্চিত। আগাম দীর্ঘদিনের সেশনজট মাথায় নিয়ে যারা ভর্তি হবে, তাদের বিষয়ে শিক্ষক সমিতি অথবা প্রশাসন কেউই দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করছে বলে মনে হয় না। ভর্তি-পরীক্ষার এই অচলাবস্থা কেবল সেশনজট তৈরি করবে না, পাশাপাশি আবাসন, শ্রেণীকক্ষ-সংকটসহ নানান জটিলতা তৈরি করবে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগেই শিক্ষক-রাজনীতির দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে নবীন শিক্ষার্থীরা। যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ না-করার দায় কোনো দায়িত্ববান শিক্ষকই এড়াতে পারেন না।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে লেখা হয়েছে: 'শিক্ষার মানোন্নয়ন', 'শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণমুক্ত' এবং 'শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস, সেশনজটমুক্ত' করা হবে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব ভাবনা জরুরি। তবে প্রতিটি দল-সরকারই সাধারণভাবে এসব কথা বললেও সরকারি দলই শিক্ষাঙ্গনে দলীয় আধিপত্য সৃষ্টি করে। ক্ষমতা লাভের পরপরই উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে এর সূত্রপাত। ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতির ছাপ পড়ে ছাত্রাবাসে, হল-প্রশাসনে, বিভাগে, নিরাপত্তা প্রশাসনে ও বিভিন্ন পদের নিয়োগে। ক্ষমতাচর্চার খাতিরে উপাচার্য যখন সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন, প্রক্টর, হল-প্রশাসন ও ছাত্র-সংগঠনকে ব্যবহার করেন; তখন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে মিথোজীবী আদানপ্রদানের সম্পর্ক। শিক্ষক সমিতি হয়ে ওঠে উপাচার্য ও সরকার-সমর্থক শিক্ষকদের তল্পিবাহক। শিক্ষকদের অনুসরণে শিক্ষার্থীদের ভেতরও ঘটে রাজনৈতিক মেরুকরণ। 'সাবেক' ক্ষমতাসীন অংশ 'নতুন' ক্ষমতাসীন অংশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ওপর ঘটানো হয় সেই ক্ষমতার প্রয়োগ। এটাই বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা। বর্তমান সরকার এই বাস্তবতার অপসারণ চাইছে—এটা নিঃসন্দেহে আশার কথা। কিন্তু এই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন কঠিন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ করা যায় প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন রূপে। শিক্ষকদের দলীয় ক্ষমতাচর্চার এ ধরনের সংস্কৃতির কারণেই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হতে পারছে না। এই সংকট থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরণ জরুরি বলে আমরা মনে করি।

● লেখকবৃন্দ: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক।